দেয়াল - হুমায়ূন আহমেদ

দেয়াল হুমায়ূন আহমেদের প্রকাশিতব্য রাজনৈতিক উপন্যাস। এ উপন্যাসের পটভূমি ১৯৭৫ সালে ঘটে যাওয়া বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য রাজনৈতিক ঘটনা। সাময়িকীর পাঠকের জন্য সুবিশাল এ উপন্যাসের দুটি অধ্যায় এখানে ছাপা হলো

দেয়াল হুমায়ূন আহমেদের প্রকাশিতব্য রাজনৈতিক উপন্যাস। এ উপন্যাসের পটভূমি ১৯৭৫ সালে ঘটে যাওয়া বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য রাজনৈতিক ঘটনা। সাময়িকীর পাঠকের জন্য সুবিশাল এ উপন্যাসের দুটি অধ্যায় এখানে ছাপা হলো

৪.

মার্চ মাস।

সে বছর মার্চ মাসে অস্বাভাবিক গরম পড়েছিল। আকাশ থেকে রোদের বদলে আগুন ঝরছে। গাছের কোনো পাতাই নড়ছে না। আসন্ন দুর্যোগে ঝিঁঝিপোকা দিনের বেলা ডাকে। এখন তা-ই ডাকছে।

প্রচণ্ড গরমে কালো পোশাক পরা আর্টিলারির প্রধান মেজর ফারুক খুব ঘামছেন। গায়ের কালো শার্ট ভিজে উঠেছে। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। আকাশ মেঘে ঢাকা। গত কয়েক দিন ধরেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে না। মেঘের কারণেই গরম বাড়ছে। গ্রিনহাউস ইফেক্ট! একসময় নাকি পৃথিবীর গরম বাড়তে বাড়তে এমন হবে যে মানুষ ও পশুপাখির বাসের অযোগ্য হবে। ফারুকের মনে হচ্ছে, সেই দিন বেশি দূর না।

মেজর ফারুক দলবল নিয়ে চট্টগ্রামের হাটহাজারীর জঙ্গলে। তাঁর শীতকালীন রেঞ্জ ফায়ারিংয়ের শিডিউল। মার্চ মাসে শীত নেই। চামড়া পোড়ানো গরম পড়েছে। সকালবেলা মাঝারি পাল্লার কামানে কয়েক দফা গুলি চালানো হয়েছে। জওয়ানরা তাঁর মতোই ক্লান্ত। তিনি সুবেদার মেজর ইশতিয়াককে ডেকে বললেন, আজকের মতো ফায়ারিং বন্ধ।

ইশতিয়াক বলল, স্যারের কি শরীর খারাপ করেছে?

ফারুক বললেন, আই অ্যাম ফাইন। গেট মি এ গ্লাস অব ওয়াটার।

তাঁর জন্য তৎক্ষণাৎ পানি আনা হলো। পানির গ্লাসে বরফের কুচি ভাসছে। ফারুক গ্লাস হাতে নিয়েও ফেরত পাঠালেন।

ইশতিয়াক বলল, স্যার, পানি খাবেন না?

ফারুক বললেন, না। একজন সৈনিক সর্ব অবস্থার জন্য তৈরি থাকবে। সামান্য গরমে কাতর হয়ে বরফ দেওয়া পানি খাবে না।

বরফ ছাড়া পানি নেই?

না। মুক্তিযুদ্ধের সময় একনাগাড়ে দুই দিন পানি না খেয়ে ছিলাম।

ইশতিয়াক বলল, পানি ছাড়া কেন ছিলেন, স্যার? বাংলাদেশে তো পানির অভাব নেই।

যেখানে ছিলাম, সেখানে সুপেয় পানির অভাব ছিল। সবই পাটপচা নোংরা পানি। ভাগ্যিস, পানি খাইনি। যারা খেয়েছিল, তারা সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। সেবার আমাদের হাতে অল্পবয়সী একজন পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন ধরা পড়েছিল। তার সঙ্গে ছিল বোতলভর্তি পানি। দাঁড়াও, তার নামটা মনে করি। এস দিয়ে নাম। ইদানীং কেন যেন পুরোনো দিনের কারোর নামই মনে পড়ে না। যাক, মনে পড়েছে। শামস। রাজপুত্রের মতো চেহারা। মাইকেল এঞ্জেলোর ডেভিডে খুঁত থাকলেও তার কোনো খুঁত ছিল না। খাঁড়া নাক, পাতলা ঠোঁট, মাথার চুল কোঁকড়ানো, আবু লাহাবের মতো গায়ের রং।

স্যার, আবু লাহাব কে?

আমাদের প্রফেটের চাচা। ওই সুরা নিশ্চয়ই পড়েছ—আবু লাহাবের দুই হস্ত ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক।

পড়েছি, স্যার। সুরা লাহাব।

লাহাব শব্দের অর্থ আগুন। 'আবু লাহাব'-এর অর্থ আগুনের পুত্র। লাহাবের গাত্রবর্ণ ছিল আগুনের মতো। ক্যাপ্টেন শামসের গায়ের বর্ণও তা-ই। সঙ্গে ক্যামেরা থাকলে তার একটা ছবি তুলে রাখতাম। মুক্তিযুদ্ধের সময় সবচেয়ে যে জিনিসটার অভাব অনুভব করেছি তা হলো, একটা ভালো ক্যামেরা। ছবি তোলার মতো অপূর্ব সব সাবজেক্ট পেয়েছি। সমস্যা হচ্ছে, সৈনিকের হাতে রাইফেল

মানায়। ক্যামেরা মানায় না। এখন অবশ্য আমার সঙ্গে ক্যামেরা আছে। লাইকা নাম। জার্মানির ক্যামেরা। কিন্তু ছবি তোলার সাবজেক্ট পাচ্ছি না।

সুবেদার মেজর ইশতিয়াক বিনীত গলায় বলল, স্যার, এক গ্লাস পানি খান। বরফ ছাড়া এক গ্লাস পানি দিতে বলি?

না। ক্যাপ্টেন শামসের গল্পটা শোনো। আমি তার পানির বোতলের সবটা পানি ঢকঢক করে খেয়ে ফেললাম। তাকে বললাম, থ্যাংক য়্যু। ইউ সেভড মাই লাইফ। পানির বদলে তুমি কিছু চাও?

সে বলল, ইয়েস! আই অলসো ওয়ান্ট টু সেইভ মাই লাইফ।

আমি বললাম, এটা সম্ভব না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমাকে হত্যা করা হবে।

সে কিছুক্ষণ শিশুর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। 'শিশুর দৃষ্টি'র অর্থ হচ্ছে, তুমি কী বলছ, আমি বুঝতে পারছি না। আমাকে বুঝিয়ে বলো।

সে বলল, আমার হাতে কতক্ষণ সময় আছে?

আমি বললাম, আধ ঘণ্টা ম্যাক্সিমাম।

সে বলল, এক কাপ কফির সঙ্গে একটা সিগারেট খেতে চাই।

চা-কফি নেই। তোমাকে সিগারেট দিতে পারব।

আমি কে-টু সিগারেটের প্যাকেট তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। তাকে বললাম, মৃত্যুর জন্য তৈরি হওয়ামাত্র আমাকে বলবে।

শামস বলল, একজন সৈনিক সব সময় মৃত্যুর জন্য তৈরি।

পাকিস্তানি ওই ক্যাপ্টেনের কথা আমার মনে ধরেছিল। এখনো সুযোগ পেলেই আমি বলি, একজন খাঁটি সৈনিক সব সময় মৃত্যুর জন্য তৈরি। একজন খাঁটি সৈনিক যুদ্ধ ছাড়াও সারা জীবন রণক্ষেত্রে কাটায়।

পাকিস্তানি ওই ক্যাপ্টেনের মৃত্যুর জন্য কি আপনার কোনো অনুশোচনা আছে?

ফারুক বললেন, অনুশোচনা নেই। তাকে আমি নিজের হাতে গুলি করি। ওই ক্যাপ্টেন আমাদের অনেক মেয়েকে রেপ করেছে। তার অভ্যাস ছিল রেপ করার পরপর সে কামড়ে মেয়েদের স্তনের বোঁটা ছিঁড়ে নিত। এটা ছিল তার ফান পার্ট।

ইশতিয়াক বলল, কী বলেন, স্যার!

যুদ্ধ ভয়াবহ জিনিস ইশতিয়াক। যুদ্ধে ফান পার্ট লাগে। যা-ই হোক, এখন এক গ্লাস পানি খাব। বরফ দিয়েই খাব। একটা জিপ রেডি করতে বলো। আমি হালিশহর যাব। একজনের সঙ্গে দেখা করব। তবে রাতেই ফিরব।

স্যার, আমি কি সঙ্গে যাব?

যেতে পারো।

হালিশহরে কার কাছে যাবেন?

একজন পীর সাহেবের কাছে যাব। তিনি জন্মান্ধ। বিহারি। কোরআনে হাফেজ বলে অনেকেই তাকে 'আন্ধা হাফেজ'ও ডাকে। তুমি কি তাঁর বিষয়ে কিছু জানো?

জি না, স্যার।

আমার জানামতে, তিনিই একমাত্র মানুষ, যিনি চোখের সামনে ভবিষ্যৎ দেখেন। আল্লাহপাক অল্প কিছু মানুষকে অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে পাঠান। তিনি তাঁদের একজন।

বলেন কী স্যার!

আমি তোমাকে সত্যি কথা বলছি। ভালো কথা, আমিও যে পীর বংশের সন্তান, তা কি জানো?

জি না, স্যার।

আমি পীর বংশের। বংশের ধারা অনুযায়ী আমি এখন গদিনশীন পীর। অথচ আমার কোনোই ক্ষমতা নেই। এটা একটা আফসোস। তবে আফসোস থাকা ভালো। মানুষই একমাত্র প্রাণী, যে পুরোপুরি সফল জীবন পার করার পরও আফসোস নিয়ে মৃত্যুবরণ করে।

ইশতিয়াক বলল, স্যার, আপনি মাঝে মাঝে ফিলোসফারদের মতো কথা বলেন।

মেজর ফারুক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, সরি ফর দ্যাট! একজন সৈনিক সব সময় সৈনিকের মতো কথা বলবে। ফিলোসফারদের মতো বা রাজনীতিবিদদের মতো কথা বলবে না। আই হেইট বোথ দ্য ক্লাসেস।

টিনের বেড়া, টিনের চালা। ছোট্ট কামরা। দড়ির চারপাইয়ের এক কোনায় প্রচণ্ড গরমেও উলের চাদর গায়ে আব্দা পীর বসে আছেন। চারপাইয়ের এক কোনায় বিশাল হারিকেন। হারিকেনের কাচ ঠিকমতো লাগানো হয়নি বলে বুনকা বুনকা ধোঁয়া বের হচ্ছে। বাতাসের কারণে ধোঁয়া যাচ্ছে আব্দা পীরের নাকে-মুখে। তাতে তাঁকে বিব্রত মনে হচ্ছে না। চাদরের বাইরে তাঁর ডানহাত বের হয়ে আছে। হাতে মোটা দানার তসবি। দানাগুলোর একেকটির রং একেক রকম।

মেজর ফারুকের হঠাৎ মনে হলো, এ রকম একটি তসবি ফরিদা পেলে খুশি হতো। মালা বানিয়ে গলায় পরত। এ ধরনের চিন্তা মাথায় আসায় ফারুক খানিকটা লজ্জিত বোধ করলেন। ফারুক বললেন, পীর সাহেব, আসসালামু আলাইকুম।

আব্দা হাফেজ সালামের জবাবে মাথা নাড়লেন। মুখে সালামের উত্তর দিলেন না।

আব্দা হাফেজ পরিষ্কার শুদ্ধ উর্দুতে বললেন (বিহারিরা শুদ্ধ উর্দু জানে না), আপনি সৈনিক মানুষ। আপনি কষ্ট করে আমার কাছে এসেছেন। আমি আপনার জন্য কী করতে পারি, বলুন।

হুজুর! আমি সৈনিক মানুষ, তা কী করে টের পেলেন?

আব্দা হাফেজ হাসতে হাসতে বললেন, আমি কোনো আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় এই সংবাদ পাইনি। আপনি বুট পায়ে দিয়ে এসেছেন, বুটের শব্দে টের পেয়েছি। বুট জোড়া খুলে আমার পাশে বসুন।

ফারুক তা-ই করলেন। আব্দা পীর বললেন, সৈনিকদের সম্পর্কে একটি রসিকতা শুনবেন?

শুনব।

বলা হয়ে থাকে, সৈনিকদের বুদ্ধি থাকে হাঁটুতে। এটা ঠিক না। তাদের বুদ্ধি থাকে বুটজুতায়। যখন তারা বুট পরে, তখন তারা বুদ্ধিশূন্য মানুষে পরিণত হয়। তখন তাদের বুদ্ধি চলে যায় বুটজুতায়। এই কারণে কোনো সৈনিক যখন আমার কাছে আসে, আমি তাকে বুট খুলে আমার কাছে বসতে বলি। এখন বলুন, আমার কাছে কেন এসেছেন?

ফারুক বললেন, আমি একটা কাজ করার পরিকল্পনা করেছি। আপনার দোয়া নিতে এসেছি।

আন্ধা পীর বললেন, আপনার ডানহাতটা আমার দিকে বাড়ান। আমি ধরে দেখি।

ফারুক হাত বাড়ালেন। আন্ধা পীর দুই হাতে ফারুকের হাত ধরলেন।

সাংবাদিক অ্যান্টনি ম্যাসকারেনহাসের কাছে দেওয়া বর্ণনায় মেজর ফারুক হাত ধরাধরির এই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, হঠাৎ ফারুকের মনে হলো শরীর দিয়ে যেন হাই ভোল্টেজের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলো। কিছুক্ষণের জন্য মনে হলো, তাঁর শরীর অবশ হয়ে গেছে।

মেজর ফারুকের বর্ণনার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ঔপন্যাসিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও সাধক অনুকূল ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাতের মিল আছে। শীর্ষেন্দু লিখেছেন, ঠাকুর আমার গায়ে হাত রাখামাত্র আমার শরীরের ভেতর দিয়ে হাই ভোল্টেজের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলো। কিছুক্ষণের জন্য মনে হলো, আমার শরীর অবশ হয়ে গেল।

আন্ধা হাফেজ ফারুকের হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন, আপনার পরিকল্পনা অতি বিপজ্জনক এবং অতি ভয়ংকর। কাজটি যদি আপনি নিজের কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য না করেন, তাহলে সফলকাম হবেন এবং বিপদেও পড়বেন না। তবে সময় এখনো আসেনি। যেকোনো কাজের জন্য নির্ধারিত সময় আছে।

ফারুক বললেন, নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে আপনি কি আমাকে জানাবেন?

জানাব।

ফারুক বললেন, যদি ইজাজত দেন তাহলে আমি উঠব।

আন্ধা হাফেজ মাথা নাড়লেন এবং ফারুকের দিকে হাতের তসবি এগিয়ে দিলেন। ক্ষীণ গলায় বললেন, আমার সামান্য উপহার গ্রহণ করুন। এই উপহার আপনার কোনো কাজে আসবে না, তা জানি। তবে আপনার প্রিয় কাউকে উপহার দিতে পারেন। একই জিনিসের নানান ব্যবহার হয়ে থাকে। যে লাঠি দিয়ে অন্ধ মানুষ পথ চলে, সেই লাঠি দিয়ে মানুষও খুন করা যায়। হাতের তসবি গলার মালাও হতে পারে।

আন্ধা হাফেজের কথার মাঝখানেই চারপাইয়ের নিচ থেকে দুটো বিড়াল লাফ দিয়ে হাফেজের দুপাশে বসল। ফারুকের মনে হলো, বিড়াল দুটিও অন্ধ।

জিপ শহরের দিকে ছুটে চলেছে। ফারুক চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। তাঁকে খুবই ক্লান্ত মনে হচ্ছে। আকাশে ঘন ঘন বিজলি চমকাচ্ছে। ঠান্ডা বাতাসও ছেড়েছে, মনে হয় দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি কি দূরেই হতে থাকবে? নাকি এগিয়ে আসবে?

বড় ধরনের ঝাঁকি খেয়ে জিপ থেমে গেল। ফারুক বললেন, সমস্যা কী?

ড্রাইভার বলল, চাকা পাংচার হয়েছে, স্যার। স্পেয়ার আছে। দশ মিনিট লাগবে।

ফারুক সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, টেক উয়োর টাইম।

ইশতিয়াক বলল, স্যার কি জিপ থেকে নামবেন?

ফারুক জবাব দিলেন না। সিগারেটে টান দেওয়ামাত্র তাঁর মাথায় আবারও পুরোনো পরিকল্পনা চলে এসেছে। শেখ মুজিবকে হত্যা করে দেশে একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটানো।

পরিকল্পনা এখন ইগল পাখি। পাখির দুটি ডানার একটি ডানা হলো সামরিক। হত্যা কীভাবে করা হবে? কারা করবে? দ্বিতীয় ডানা হচ্ছে রাজনৈতিক। এত বড় ঘটনা রাজনৈতিকভাবে কীভাবে সামাল দেওয়া হবে? এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁর ভায়রা ভাই মেজর রশীদকে। সে ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে। তার ওপর ভরসা করা যায়।

কাগজ-কলমে করা নিখুঁত পরিকল্পনা বাস্তবে ভেস্তে যায়। তুচ্ছ কারণেই ঘটে। এ কিংডম ইজ লস্ট ফর এ নেইল।

পরিকল্পনা কী কী কারণে জলে ভেসে যেতে পারে, ফারুক তা ভাবার চেষ্টা করছেন।

১. বাস্তবায়নের আগেই পরিকল্পনা প্রকাশ পেয়ে যাবে। পরিকল্পনাকারীরা ধরা খাবে। তাদের কোর্ট মার্শাল হবে। পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন শামস যেভাবে হতভম্ব চোখে পিস্তলের নলের দিকে তাকিয়ে ছিল, তাঁকেও সেভাবেই কোনো এক পিস্তলের নলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে।

২. মূল পরিকল্পনা অতি অল্প কিছু মানুষকে জানানো হবে, যাদের দিয়ে কার্য সমাধা করতে হবে। তারা বেঁকে বসতে পারে। তারা বলতে পারে, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার প্রশ্নই ওঠে না।

৩. ফারুকের হাতে ট্যাংকবহর আছে। মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত উপহার হিসেবে ৩০টি টি-৫৪ ট্যাংক এবং ৪০০ রাউন্ড ট্যাংকের গোলা বাংলাদেশকে উপহার হিসেবে দিয়েছেন।

গোলাগুলো এখন গাজীপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে তালাবদ্ধ। ফারুক ট্যাংক বাহিনীর প্রধান, কিন্তু তাঁর ট্যাংক গোলাশূন্য। এমনকি মেশিনগানের গুলি পর্যন্ত নেই। এই ট্যাংক আর খেলনা ট্যাংক তো একই।

জিপ চলতে শুরু করেছে। জিপের চাকা কখন বদল হয়েছে, কখন জিপ চলতে শুরু করেছে, ফারুক কিছুই জানেন না। তিনি এতক্ষণ ছিলেন ঘোরের মধ্যে। হঠাৎ ঘোর কেটেছে।

ফারুক আনন্দে অভিভূত হলেন। কারণ, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। ঝুম বৃষ্টি। তাঁর ইচ্ছা করছে, জিপ থামিয়ে কিছুক্ষণ রাস্তায় নেমে বৃষ্টিতে ভিজেন। তিনি বৃষ্টিবিষয়ক একটি বিখ্যাত কবিতা মনে করার চেষ্টা করছেন। কিছুতেই মনে পড়ছে না। শুধু একটা লাইন মনে আসছে, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।'

খন্দকার মোশতাকের আগামসি লেনের বাড়ির দোতলায় মেজর রশীদ বসে আছেন। তাঁর গায়ে সামরিক পোশাক না। তিনি আজ নকশিদার পাঞ্জাবি পরেছেন। মাথায় কিস্তি টুপি পরেছেন। তাঁকে দেখে মনে হবে, কিছুক্ষণ আগে তিনি একবার নামাজ শেষ করে বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন।

মেজর রশীদ বললেন, দেশের মহাবিপদ যদি কখনো হয়, আমরা কি আপনাকে পাব?

খন্দকার মোশতাক জবাব দিলেন না। ফরাসি হুক্কা টানতে লাগলেন। অতিরিক্ত গরমের কারণে খন্দকার মোশতাকের গায়ে পাতলা স্যান্ডো গেঞ্জি। মাথায় নেহরু টুপি। তাঁর আশা ছিল, এই টুপি দেশে জনপ্রিয় হবে। তা হয়নি। মুজিবকোট জনপ্রিয় হয়েছে। কালো রঙের এই কোট পরলে নিজেকে পেঙ্গুইন পাখির মতো লাগে। তার পরও কপালের ফেরে পরতে হয়।

মেজর রশীদ বললেন, আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করেছিলাম, আপনি জবাব দেননি। প্রশ্নের জবাব জানা বিশেষ প্রয়োজন। প্রশ্নটা আবার করছি। দেশের পরম সংকটে আমরা কি আপনাকে পাব?

খন্দকার মোশতাক বললেন, আমরা মানে কারা?

সেনাবাহিনী।

খন্দকার মোশতাক মূল প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বললেন, গরম কি পড়েছে দেখেছেন? ফ্যানের বাতাসে লু হাওয়া।

রশীদ বললেন, লু হাওয়া বইতে শুরু করেছে। এই অবস্থায় দেশপ্রেমিকদের কর্তব্য কী?

খন্দকার মোশতাক বললেন, খানা খান। খানা দিতে বলি।

খানা খাব না। আমি আপনার কাছে খানা খেতে আসিনি। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য এসেছি।

মোশতাক বললেন, বাড়িতে আজ মোরগপোলাও হয়েছে। খেয়ে দেখেন, মুখে অনেক দিন স্বাদ লেগে থাকবে। তা ছাড়া আপনি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে এসেছেন। খেতে খেতে বলুন। আমি এখন হ্যাঁ-না কিছু বলব না। আমি শুধু শুনে যাব।

মেজর রশীদ বললেন, আপনার সম্পর্কে একটি বিশেষ গল্প প্রচলিত। গল্পটির সত্য-মিথ্যা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই।

খন্দকার মোশতাক শীতল গলায় বললেন, কী গল্প?

একবার নাকি আপনি, পরিকল্পনা পরিষদপ্রধান ড. নূরুল ইসলাম এবং বঙ্গবন্ধু নাশতা খাচ্ছিলেন। হঠাৎ বঙ্গবন্ধু বললেন, গত রাতে আমি অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখেছি।

আপনি জানতে চাইলেন, কী স্বপ্ন?

বঙ্গবন্ধু বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আল্লাহপাক আমাকে কোরবানির নির্দেশ দিলেন। তারপর ঘুম ভেঙে গেল। এখন আমি কোরবানি দিতে প্রস্তুত। কোরবানি দিতে হয় সবচেয়ে প্রিয়জনকে। এই মুহূর্তে আমার সবচেয়ে প্রিয়জন হলো খন্দকার মোশতাক। ভাবছি তাকেই কোরবানি দিব।

মেজর রশীদ কথা শেষ করে তাকিয়ে রইলেন। খন্দকার মোশতাক বললেন, শেখ মুজিবের কোনো রসবোধ নেই। ভুল সময়ে ভুল রসিকতা করে তিনি আনন্দ পান। আর আমরা পেঙ্গুইনরা তাঁকে আনন্দ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকি। এটা আমাদের নিয়তি।

মেজর রশীদ বললেন, গল্পটায় কি সত্যতা আছে?

না।১

বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে এসেছেন র'-এর (ভারতের সিক্রেট সার্ভিস রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং) পরিচালক কাও। তিনি এসেছেন পান বিক্রেতার ছদ্মবেশে।

শেখ মুজিবুর রহমান বিরক্ত গলায় বললেন, আমি আপনাকে চিনি। অনেকেই আপনাকে চেনে। আপনার ছদ্মবেশ ধরার প্রয়োজন পড়ল কেন?

কাও বললেন, মাঝে মাঝে নিজেকে অন্য রকম ভাবতে ভালো লাগে বলেই ছদ্মবেশ। আপনাকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র হচ্ছে। মেজর রশীদ, ফারুক, লে. কর্নেল ওসমানী এ বিষয়ে আলোচনায় বসেন জেনারেল জিয়াউর রহমানের বাসায়। এই বিষয়ে আপনাকে তথ্য দিতে এসেছি।

শেখ মুজিব বললেন, আপনারা অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণ। পান বিক্রেতার ছদ্মবেশে যে আমার কাছে তথ্য দিতে আসে, তার কথায় আমার বিশ্বাস নেই।

আপনার সামনে মহাবিপদ।

মহাবিপদ আমি পার করেছি। পাকিস্তানের কারাগারে যখন ছিলাম, তখন বিপদ আমার ঘাড়ে বসে ছিল। এখন বিপদ ঘাড় থেকে নেমেছে।

ঘাড় থেকে নামেনি, স্যার।

শেখ মুজিব বললেন, যাদের কথা আপনি বলছেন, তারা আমার সন্তানসম। আমি এই আলোচনা আর চালাব না। আমার শরীরটা ভালো না। যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমি ঘুমুতে যাব।২

১০.

হরিদাসের চুল কাটার দোকান সোবহানবাগে। তার দোকানের একটু সামনেই ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর রোডের মাথা। সংগত কারণেই হরিদাস তার সেলুনে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে রেখেছে:

শেখের বাড়ি যেই পথে

আমার সেলুন সেই পথে।

সাইনবোর্ডের লেখা পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে হরিদাস পথচারীদের জন্য এই সাইনবোর্ড টাঙায়নি। তার মনে ক্ষীণ আশা, কোনো একদিন এই সাইনবোর্ড বঙ্গবন্ধুর নজরে আসবে। তিনি গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে আসবেন। গম্ভীর গলায় বলবেন, সেলুনের সাইনবোর্ডে কী সব ছাতা-মাথা লিখেছিস। নাম কী তোর? দে, আমার চুল কেটে দে। চুল কাটার পর মাথা মালিশ।

বঙ্গবন্ধুর পক্ষে এ ধরনের কথা বলা মোটেই অস্বাভাবিক না, বরং স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তিনি এমন আচরণ করেন বলেই তাঁর টাইটেল ‘বঙ্গবন্ধু’।

হরিদাস চুল কাটার ফাঁকে ফাঁকে খদ্দের বুঝে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গল্প ফাঁদে। খদ্দেররা বেশির ভাগই তার কথা বিশ্বাস করে। হরিদাস কাঁচি চালাতে চালাতে বলে, আমার কথা বিশ্বাস করবেন কি না জানি না। যে কেঁচি দিয়া আপনের চুল কাটতেছি, সেই কেঁচি দিয়া স্বয়ং বঙ্গবন্ধুর চুল কেটেছি। তাও একবার না, তিনবার। প্রথমবারের ঘটনাটা বলি, চৈত্র মাসের এগারো তারিখ। সময় আনুমানিক এগারোটা...

পনেরোই আগস্ট শেষরাতে হরিদাস তার দোকানে ঘুমাচ্ছিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙল। মড়মড় শব্দ হচ্ছে—দোকান ভেঙে পড়ছে। হরিদাস ভূমিকম্প হচ্ছে ভেবে দৌড়ে দোকান থেকে বের হয়ে হতভম্ব। এটা আবার কী?

আলিশান এক ট্যাংক তার দোকানের সামনে ঘুরছে। ট্যাংকের ধাক্কায় তার দোকান ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। ট্যাংকের ঢাকনা খোলা। দুজন কালো পোশাকের মানুষ দেখা যাচ্ছে। দোকান ভেঙে ফেলার জন্য কঠিন কিছু কথা হরিদাসের মাথায় এসেছিল। সে কোনো কথা বলার আগেই ট্যাংকের পেছনের ধাক্কায় পুরো দোকান তার মাথায় পড়ে গেল। পনেরোই আগস্ট হত্যাকাণ্ডের সূচনা করল হরিদাস।

ঢাকা মসজিদের শহর। সব মসজিদেই ফজরের আজান হয়। শহরের দিন শুরু হয় মধুর আজানের ধ্বনিতে। আজান হচ্ছে। আজানের ধ্বনির সঙ্গে নিতান্তই বেমানান কিছু কথা বঙ্গবন্ধুকে বলছে এক মেজর, তার নাম মহিউদ্দিন। এই মেজরের হাতে স্টেনগান। শেখ মুজিবের হাতে পাইপ। তাঁর পরনে সাদা পাঞ্জাবি এবং ধূসর চেক লুঙ্গি।

শেখ মুজিব বললেন, তোমরা কী চাও? মেজর বিব্রত ভঙ্গিতে আমতা-আমতা করতে লাগল। শেখ মুজিবের কঠিন ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। শেখ মুজিব আবার বললেন, তোমরা চাও কী?

মেজর মহিউদ্দিন বলল, স্যার, একটু আসুন।

কোথায় আসব?

মেজর আবারও আমতা-আমতা করে বলল, স্যার, একটু আসুন।

শেখ মুজিব বললেন, তোমরা কি আমাকে খুন করতে চাও। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যে কাজ করতে পারেনি, সে কাজ তোমরা করবে?

এই সময় স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে ছুটে এল মেজর নূর। শেখ মুজিব তার দিকে ফিরে তাকানোর আগেই সে ব্রাশফায়ার করল। সময় ভোর পাঁচটা চল্লিশ। বঙ্গপিতা মহামানব শেখ মুজিব সিঁড়িতে লুটিয়ে পড়লেন। তখনো বঙ্গবন্ধুর হাতে তাঁর প্রিয় পাইপ।

বত্রিশ নম্বর বাড়িটিতে কিছুক্ষণের জন্য নরকের দরজা খুলে গেল। একের পর এক রক্তভেজা মানুষ মেঝেতে লুটিয়ে পড়তে লাগল।

বঙ্গবন্ধুর দুই পুত্রবধূ তাঁদের মাঝখানে রাসেলকে নিয়ে বিছানায় জড়াজড়ি করে শুয়ে থরথর করে কাঁপছিল। ঘাতক বাহিনী দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকল। ছোট্ট রাসেল দৌড়ে আশ্রয় নিল আলনার পেছনে। সেখান থেকে শিশু করুণ গলায় বলল, তোমরা আমাকে গুলি কোরো না।

শিশুটিকে তার লুকানো জায়গা থেকে ধরে এনে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হলো। এরপর শেখ জামাল ও শেখ কামালের মাত্র কিছুদিন আগে বিয়ে হওয়া দুই তরুণী বধূকে হত্যার পালা।

বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি মন্ত্রী সেরনিয়াবাত এবং ভাগনে শেখ মণির বাড়িও একই সঙ্গে আক্রান্ত হলো। সেখানেও রক্তগঙ্গা। শেখ মণি মারা গেলেন তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর সঙ্গে। পিতামাতার মৃত্যুদৃশ্য শিশু তাপস দেখল খাটের নিচে বসে। এই শিশুটি তখন কী ভাবছিল? কেবিনেট মন্ত্রী সেরনিয়াবাত মারা গেলেন তাঁর দশ-পনেরো বছরের দুই কন্যা, এগারো বছর বয়সী এক পুত্র এবং মাত্র পাঁচ বছর বয়সী এক নাতির সঙ্গে।

সকাল সাতটা।

বাংলাদেশ বেতার ঘন ঘন একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করছে। উল্লসিত গলায় একজন বলছে, 'আমি ডালিম বলছি। স্বৈরাচারী মুজিব সরকারকে এক সেনা-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত করা হয়েছে। সারা দেশে মার্শাল ল জারি করা হলো।'

দেশ থমকে দাঁড়িয়েছে।

কী হচ্ছে কেউ জানে না। কী হতে যাচ্ছে, তাও কেউ জানে না।

মানুষের আত্মার মতো দেশেরও আত্মা থাকে। কিছু সময়ের জন্য বাংলাদেশের আত্মা দেশ ছেড়ে গেল।

মেজর জেনারেল জিয়া বঙ্গবন্ধু হত্যার খবর শুনে নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন, প্রেসিডেন্ট নিহত, তাতে কী হয়েছে? ভাইস প্রেসিডেন্ট তো আছে। কনস্টিটিউশন যেন ঠিক থাকে।

বঙ্গবন্ধুর অতি কাছের মানুষ রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদ বসে আছেন রক্ষীবাহিনীর সদর দপ্তর সাভারে। আতঙ্কে তিনি অস্থির। রক্ষীবাহিনী আত্মসমর্পণ করে তাঁকে নিয়ে পড়েছে। তারা বারবার জানতে চাইছে, তোফায়েল আহমেদকে নিয়ে কী করবে? বঙ্গবন্ধুকে রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত রক্ষীবাহিনী ঝিম ধরে বসে আছে। একসময়ের সাহসী তেজি ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদও ঝিম ধরে আছেন। শুরু হয়েছে ঝিম ধরার সময়।

রাস্তায় মিছিল বের হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, সেই মিছিল আনন্দ-মিছিল।

শফিক বাংলামোটর গিয়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। সেখানে রাখা ট্যাংকের কামানে ফুলের মালা পরানো। কিছু অতি উৎসাহী ট্যাংকের ওপর উঠে নাচের ভঙ্গি করছে।

আমার বাবর রোডের বাসার কথা বলি, বেতারে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর খবর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে একতলায় রক্ষীবাহিনীর সুবেদার পালিয়ে গেলেন। তাঁর দুই মেয়ে, একজন গর্ভবতী, ছুটে এল মায়ের কাছে। তাদের আশ্রয় দিতে হবে। মা বললেন, তোমাদের আশ্রয় দিতে হবে কেন? তোমরা কী করেছ? তারা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, খালাম্মা, এখন পাবলিক আমাদের মেরে ফেলবে।

এই ছোট্ট ঘটনা থেকে রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার এবং তাদের প্রতি সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ও ঘৃণাও টের পাওয়া যায়।

খন্দকার মোশতাক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়লেও ফজরের নামাজটা সময়মতো পড়তে পারেন না। তিনি অনেক রাত জাগেন বলেই এত ভোরে উঠতে পারেন না।

পনেরোই আগস্ট তাঁর ঘুম ভাঙল আটটায়। শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হয়েছেন—এই খবর তাঁকে দেওয়া হলো। তিনি বললেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। খবর নিয়ে এসেছেন তাঁর ভাতিজা মোফাজ্জল। তাকে ভীত ও চিন্তিত দেখাচ্ছে। মোফাজ্জল বলল, রেডিও ছাড়ব? খবর শুনবেন?

মোশতাক বললেন, না। কড়া করে এক কাপ চা আনো। চা খাব।

মোফাজ্জল বলল, আপনি কি বাড়িতেই থাকবেন, না পালিয়ে যাবেন?

পালিয়ে যাব কোন দুঃখে? আমি অপরাধ কী করেছি?

সদর দরজায় কি তালা লাগায়া রাখব?

না। সদর দরজা থাকবে খোলা। তুমি নিজে সেখানে টুল পেতে বসে থাকবে। আমার সঙ্গে কেউ দেখা করতে চাইলে তাকে সম্মানের সঙ্গে নিয়ে আসবে।

কে আসবে দেখা করতে?

মোশতাক এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বাথরুমে ঢুকলেন। পরিস্থিতি সামলানোর জন্য কিছু সময় নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা দরকার। বাথরুম হলো নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্য আদর্শ স্থান।

তিনি অজু করে বাথরুম থেকে বের হলেন। ফজরের নামাজ আদায় করলেন। আল্লাহপাকের কাছে নিজের নিরাপত্তা চেয়ে দুই রাকাত নফল নামাজ শেষ করে নেয়ামুল কোরআন নিয়ে বসলেন। আল্লাহপাকের নিরানব্বই নাম পাঠ করে আজকের দিন শুরু করবেন।

ইয়া আল্লাহু (হে আল্লাহ)

ইয়া রহমানু (হে করুণাময়)

ইয়া রাহিমু (হে পরম দয়ালু)

ইয়া মালেকু (হে প্রভু)

ইয়া কুদ্দুস (হে পবিত্রতম)

ইয়া সালামু (হে শান্তি দানকারী)

'ইয়া সালামু' পড়ার পরপরই বিকট ঘড় ঘড় শব্দ শোনা যেতে লাগল। মোশতাক তাঁর তিনতলার শোবারঘরের জানালা দিয়ে তাকালেন। তাঁর কলিজা শুকিয়ে গেল। বিকটদর্শন এক ট্যাংক তাঁর বাড়ির সামনে। ট্যাংকের কামান তাঁর শোবার ঘরের দিকে তাক করা। ঘটনা কী? ট্যাংক কেন? এত দিন যা শুনে এসেছেন তার সবই কি ভুয়া? ট্যাংকের গোলার আঘাতে তাঁকে মরতে হবে? ট্যাংক কোনো শান্তির পতাকাবাহী যুদ্ধযান না। অকারণে কেউ নিশ্চয়ই তাঁর বাড়ির সামনে ট্যাংক বসাবে না।

সিঁড়িতে বুটজুতার শব্দ হচ্ছে। খন্দকার মোশতাক একমনে দোয়ায়ে ইউনুস পড়তে লাগলেন। এই দোয়া পাঠ করে ইউনুস নবী মাছের পেট থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। তাঁর বিপদ ইউনুস নবীর চেয়ে বেশি।

দরজা খুলে মেজর রশীদ ঢুকলেন। তাঁর হাতে স্টেনগান। তাঁর পেছনে দুজন সৈনিক। তাঁদের হাতেও স্টেনগান। সৈনিক দুজন স্টেনগান মোশতাকের দিকে তাক করে আছে।

মোশতাক নিশ্চিত মৃত্যু ভেবে আল্লাহপাকের কাছে তওবা করলেন। মেজর রশীদ বললেন, স্যার চলুন। মোশতাক বললেন, কোথায় যাব?

প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। প্রথমে রেডিও স্টেশনে যাবেন। জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।

ট্যাংক এসেছে কেন?

প্রেসিডেন্টের মর্যাদা রক্ষার জন্য ট্যাংক এসেছে।

মোশতাক বললেন, শুক্রবারে আমি জুমার নামাজের আগে কোনো কাজকর্ম করি না। দায়িত্ব যদি গ্রহণ করতে হয়, জুমার নামাজের পর।

মেজর রশীদ কঠিন গলায় বললেন, আপনাকে আমি নিতে এসেছি, আপনি আমার সঙ্গে যাবেন। অর্থহীন কথা বলে নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই।

মোশতাক বললেন, অবশ্যই অবশ্যই। তবে আমাকে কিছু সময় দিতে হবে।

আপনাকে কোনো সময় দেওয়া হবে না।

কাপড় চেঞ্জ করার সময় দিতে হবে। আমি নিশ্চয়ই লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরে প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিব না?

সকাল এগারোটা পঁয়তাল্লিশে খন্দকার মোশতাক বেতারে ভাষণ দিলেন। তিনি আবেগমথিত গলায় বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের 'সূর্যসন্তান' আখ্যা দিলেন।

মোশতাকের ভাষণের পর বঙ্গভবনে আনন্দ উল্লাস, কোলাকুলি, একে অন্যকে অভিনন্দনের পালা শুরু হয়ে গেল।

বঙ্গবন্ধুর মৃতদেহ তখনো তাঁর বত্রিশ নম্বর বাড়িতে পড়ে আছে।

সন্ধ্যাবেলা শফিক এসেছে রাধানাথ বাবুর কাছে। শফিকের বিপর্যস্ত ভঙ্গি দেখে তিনি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললেন। শফিক কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, এত বড় ঘটনা ঘটে গেল, আর কেউ প্রতিবাদ করল না! কেউ তাঁর পাশে দাঁড়াল না!

রাধানাথ বললেন, কেউ তাঁর পাশে দাঁড়ায়নি এটা ঠিক না। খবর পেয়েছি ব্রিগেডিয়ার জামিলউদ্দিন আহমেদ বঙ্গবন্ধুকে রক্ষার জন্য ছুটে গিয়েছিলেন। গুলি খেয়ে মারা গেছেন। পুলিশের কিছু কর্মকর্তা বাধা দিয়েছিলেন। তাঁরাও মারা গেছেন।

শফিক বলল, কেউ তাঁর পক্ষে রাস্তায় বের হয়ে কিছু বলবে না?

রাধানাথ বললেন, তুমি কি রাস্তায় বের হয়ে কিছু বলেছ? তুমি যেহেতু বলোনি, অন্যদের দোষ দিতে পারবে না। আমার কথা বুঝতে পেরেছ?

জি।

রাধানাথ বললেন, সাহস আছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলার—'মুজিব হত্যার বিচার চাই?'

শফিক বলল, আমার সাহস নেই। আমি খুবই ভীতু মানুষ। কিন্তু আমি বলব।

কবে বলবে?

আজ রাতেই বলব।

রাত আটটা। মনে হচ্ছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে। খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। তিন বাহিনীর প্রধান নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছেন। পুরোনো মন্ত্রিসভার প্রায় সবাইকে নিয়েই নতুন মন্ত্রিসভা তৈরি হয়েছে। নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা যুক্ত হয়েছেন। আতাউল গনি ওসমানী হয়েছেন প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা।

মনে হচ্ছে পুরোনো আওয়ামী লীগই আছে, শুধু শেখ মুজিবুর রহমান নেই। আপসহীন জননেতা মওলানা ভাসানী, যিনি এক মাস আগেও বঙ্গবন্ধুকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন, তিনিও নতুন সরকারকে সমর্থন জানালেন।

পনেরোই আগস্ট রাত নয়টার দিকে সরফরাজ খানের বাড়ির সামনের রাস্তায় এক যুবককে চিৎকার করতে করতে সড়কের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত যেতে দেখা গেল। সে

চিৎকার করে বলছিল, 'মুজিব হত্যার বিচার চাই'। যুবকের পেছনে পেছনে যাচ্ছিল ভয়ংকরদর্শন একটি কালো কুকুর।

সেই রাতে অনেকেই রাস্তার দুপাশের ঘরবাড়ির জানালা খুলে যুবককে আগ্রহ নিয়ে দেখছিল। সঙ্গে সঙ্গে জানালা বন্ধও করে ফেলছিল।

আচমকা এক আর্মির গাড়ি যুবকের সামনে এসে ব্রেক কষল। গাড়ির ভেতর থেকে কেউ একজন যুবকের মুখে টর্চ ফেলল। টর্চ সঙ্গে সঙ্গে নিভিয়ে ইংরেজিতে বলল, ইয়াং ম্যান, গো হোম। ট্রাই টু হ্যাভ সাম স্লিপ।

শফিককে এই উপদেশ যিনি দিলেন, তিনি ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। যান, যান, বাসায় যান।

শফিক বলল, জি স্যার। যাচ্ছি।

খালেদ মোশাররফ বললেন, আমি আপনাকে চিনি। অবন্তীদের বাসায় দেখেছি। আপনি অবন্তীর গৃহশিক্ষক।

জি।

গাড়িতে উঠুন। আপনি কোথায় থাকেন, বলুন। আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।

আমি হেঁটে যেতে পারব। তা ছাড়া আমার সঙ্গে এই কুকুরটা আছে। কুকুর নিয়ে আপনার গাড়িতে উঠব না।

শফিক চলে যাচ্ছে। জিপ দাঁড়িয়ে আছে। খালেদ মোশাররফ সিগারেট ধরিয়ে অবন্তীর গৃহশিক্ষকের দিকে তাকিয়ে আছেন।

রাত বারোটার কিছু পরে চাদরে নাক-মুখ ঢেকে ছানু ভাই উপস্থিত হলেন পীর হাফেজ জাহাঙ্গীরের হুজরাখানায়।

হাফেজ জাহাঙ্গীরের রাতের ইবাদত শেষ হয়েছে। তিনি ঘুমোতে যাচ্ছিলেন। ছানু ভাইকে দেখে এগিয়ে এলেন।

ছানু বললেন, পীর ভাই, রাতে থাকার জায়গা দেওয়া লাগে। বিপদে আছি।

কী বিপদ?

বঙ্গবন্ধু নাই। আমরা যারা তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ, তারাও নাই। বাংলাদেশের পাবলিক হলো, ব্রেইন ডিফেক্ট পাবলিক। যেকোনো একজন যদি বলে, ধরো, ছানুরে ধরো। পাবলিক দৌড় দিয়া আমারে ধরবে।

আপনার থাকার ব্যবস্থা করছি। রাতের খানা কি খেয়েছেন?

রাতের খানা কখন খাব, বলেন? দৌড়ের ওপর আছি। খানার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। আরেকটা কথা, সরফরাজ খান সাহেব কি আছেন?

আছেন।

ভালো হয়েছে, উনাকে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি বুঝায়ে দিব। খানসাহেবকে আমি বড় ভাইয়ের মতো দেখি, শ্রদ্ধা করি।

সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের বিখ্যাত গ্রন্থ লিগেসি অব ব্লাড-এ উল্লেখ করা হয়েছে, শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর পর টুঙ্গিপাড়ার তাঁর পৈতৃক বাড়িতে স্থানীয় জনগণ হামলা করে এবং বাড়ির সব জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়।

হায়রে বাংলাদেশ!

১. গল্পটির সত্যতা আছে। বাংলা একাডেমী পত্রিকা উত্তরাধিকার, শ্রাবণ সংখ্যা, ১৪১৭ দ্রষ্টব্য।

২. ইনসাইড র: দ্য স্টোরি অব ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিস, অশোক রায়না, বিকাশ পাবলিকেশন, নয়াদিল্লি, ভারত।